’একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ’ হাজার বছরের বাঙালী জাতির ইতিহাসে এক অসাধারণ গৌরব গবের অবিস্মরণীয় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধে নোয়াখালীবাসীর অনন্য ভূমিকা ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদান ইতিহাসের পাতায় বীরগাথা গর্ব গৌরবের অধ্যায় হিসেবে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে ২৬ মার্চ নোয়াখালীর জেলা প্রশাসক সার্কিট হাউজে সর্বদলীয় এবং গন্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে এক আলোচনা সভা আহবান করেন। সে সভায় তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশের কথা উপস্থিত ব্যক্তিবর্গেও কাছে উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলার সরকারি অফিসের কর্মকর্তা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। সভায় সকলেই যার যা কিছু আছে তা নিয়ে সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ার শপথ নেন।

২৬ মার্চ টাউন হলে মরহূম রফিক উল্যাহ কমান্ডারের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী, আনসার, পুলিশ, ইপিআর, আওয়ামিলীগ, ছাত্রলীগের সদসবৃন্দ একত্রিত হয়ে একটি দল গঠন করা হয়। দলটি প্রাথমিক পর্যায়ে ফেনী কারিগারি মহাবিদ্যালয়ে অবস্থানরত পাকবাহিনীর উপর হামলা চালায়। সল্প সময়ের মধ্যে দলটি দলটি পশ্চিমা সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে মাইজদীতে ফিরে আসে।

মাইজদী টাউন হলে এরই মধ্যে একটি কন্ট্রোল রুম খোলা হয়। স্থানীয় প্রশাসনকে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য আহবান জানানো হয়। আহবানে সারা দিয়ে জেলা প্রশাসন, পুলিশ বিভাগ পুর্ণাঙ্গভাবে সহযোগিতা করেন। চারদিকে তখন যুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু হয় । মাইজদী পুলিশ লাইন (বর্তমানে পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার) ম্যাগজিন থেকে ধার করা অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধংদেহী তরুন ছাত্র, শ্রমিক, বৃদ্ধদেও সবাইকে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এরই মধ্যে মুক্তিবাহিনী গঠন করার জন্য এম, পি নুরুল হক মিয়ার আহবানে জেলা প্রশাসকের পরামর্শক্রমে জেলা আর্মড সার্ভিসেস বোর্ডের সেক্রেটারী সফিকুর রহমানের স্বাক্ষরে সেনাবাহিনীর প্রাক্তন ও ছুটিতে আসা সদস্যদের আহবান করা হয় প্রশিক্ষণক্যাম্পে রিপোর্ট করার জন্য। নুরুল হক মিয়াকে প্রশাসন থেকে জীপ দেয়া হয় বিভিন্ন স্থান থেকে সদস্য সংগ্রহ করার জন্য। মাইজদীতে প্রাইমারী ট্রেনীং ইনস্টিটিউট (পি টি আই) এ একটি, ফেণীর মিজান ময়দান ও মাদ্রাসা মিলিয়ে একটি এবং ফেনী স্কুলে একটি অস্ত্র প্রশিক্ষন শিবির স্থাপন করা হয়। এ সকল ট্রেনিং সেন্টাওে হাজার হাজার মুক্তিযোদ্ধা অংশগ্রহণ করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিরোধ যুদ্ধ ছিল বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক ভিত্তিতে। অবশেষে ১৭ এপ্রিল মুজিব নগরে আনুষঠানিকভাবে সবাধীন বাংলাদেশের অসহায়ী সরকার গঠিত হলে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধেও গতি নুতন অধ্যায়ের সুচনা করে। এ সময় ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশের প্রায় শহরাঞ্চল হানাদার বাহিনীর কবলিত হলেও বৃহত্তর নোয়াখালীর সমগ্র এলাকা ছিল পাক হানাদার মুক্ত। এখানে ২২ এপ্রিল পর্যমত বাংদেশের পতাকা উড়েছিল এবং এখানকার প্রশাসন নোয়াখালীর কেন্দ্রীয় সংগ্রাম পরিষদের নিয়মত্রণে ছিল।

ইতোমধ্যে পাকসেনাদের আগমন পথে বাধার সৃষিটর জন্য লাকসাম, নীলকমল, চর জববর, শুভপুর প্রভৃতি সহানে প্রতিরোধ ব্যবসহা গড়ে তোলা হয়। সুবেদার লুৎফর রহমান ও সুবেদার সামছল হকের নেতৃত্বে ৪ এপ্রিল লাকসামের উত্তরে বাঘমারায় প্রথম সংঘর্ষ হয়। এরপর ১০ এপ্রিল লাকসামে সম্মুখ যুদ্ধে মাত্র ৭০জন মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে পরিচালিত যুদ্ধে ২৬জন হানাদার সৈন্য নিহত ও ৬০ জনকে আহন করা হয়। ২০ এপ্রিল নাথের পেটুয়াতে, ২১ এপ্রিল সোনাইমুড়ী রেল স্টেশনের আউটার সিগনালের কাছে, ১ মে বগাদিয়ায় নায়েক সিরাজের নেতৃত্বে সম্মুখ যুদ্ধে ১৫/২০ জন পাকসেনা নিহত হয়। সে যুদ্ধে ২জন বীর মুক্তি যোদ্ধা শহীদ হন।

৯ মে সুবেদার ওয়ালি উল্যার নেতৃত্বে পুনরায় বগাদিয়ায় যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে নায়েক সুবেদার ওয়ালি উল্যার কপালে গুলি লাগে এবং তিনি আহন হন। ১০ মে বাংলা বাজারের পুর্বদিকে পাক সেনাদের সাথে যুদ্ধ হয়, ১১ মে সুবেদার ওয়ালি উল্যাহ এবং নায়েক আবুল হোসেন, লক্ষমীপুরের হাবিলদার মতিনের নেতৃত্বে মীরগঞ্জে খান সেনাদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে কয়েক জন পাকসেনা নিহত হয় এবং অপর খান সেনারা পালিয়ে যায়। এখনে খান সেনাদের ফেলে যাওয়া বহু অসএ শসএ মুক্তি যোদ্ধাদের হস্তগত হয়। এছাড়া ১৩ মে রামগঞ্জের নিকট, ১৪ মে বিপুলাশার রেল স্টেশনে, ১৫ মে বগাদিয়ায় পুনরায় যুদ্ধ হয়। ২৬ মে দালাল বাজারে সুবেদার লুৎফর রহমানের নেতৃত্বে নায়ের আবুল হোসেন, নায়ের সুবেদার ইসহাক ও সুবেদার ওয়ালি উল্যাহ অসম সাহসীকতার পরিচয় দেন। ২৮ মে সুবেদার ওয়ালি উল্যা মাইন দ্বারা সাহেবজাদার পুলটি ধ্বংস করে। এতে লাকসাম-নোয়াখালীর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বিলোনিয়াসহ নোয়াখালীকে ২নং সেক্টরের অধীনে আনা হয় এবং ৫টি জোনে ভাগ করা হয়। ২নং সেক্টরের প্রধান ছিলেন মেজর খালেদ মোশারেফ (এপ্রিল-সেপ্টেমবর) এবং মেজন এটিএম হায়দার (সেপ্টেমবর-ডিসেমবর) এ বাহিনী কে ফোর্স নামে পরিচিত ছিল। জোনগুলোর নামকরণ করা হয় যথাক্রমে এ, বি, সি, ডি, ই এবং হাতিয়াকে আলাভাবে রাখা হয়। তাছাড়া ঢাকা-চট্টগ্রাম ট্রাঙ্ক রোড়ের পার্শেবও এলাকাকে নোয়াখালী মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। জেলা সদরের পুর্বাঞ্চলের ডি জোনের কমান্ডার ছিলেন রফিক উল্যাহ। মুজিব বাহিনীর কামান্ডার হন এ অদুদ পওে আবুল কাসেম। এ মুক্তি যোদ্ধাদের অধীনে কোম্পানীগঞ্জ, চাপরাশির হাট, মিঞার হাট, মৃধার হাট, কালামুন্সী প্রভৃতি এলাকা ছিল। জেলা সদরের পশ্চিমে সি জোনের কমান্ডার ছিলেন আলী আহম্মদ চৌধুরী ও অন্যান্যরা হাবিলদার সিরাজ উল্যাহ, শাহ

আলম বকুল দায়িত্ব পালন করেন। এ জোনের অধীনে ছিল মাইজদী, রামগঞ্জ, ংচন্দ্রগঞ্জ, ভবানীগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, খলিফার হাট, বাধেরহাট, ওদার হাট ও বাংলা বাজার।

ইতিমধ্যে বৃহত্তর নোয়াখালীর বি.এল.এফ এর অধিনায়ক জনাব মাহমুদুর রহমান বেলায়েত (সাবেক এম.পি. চাটখিল উপজেলা) এবং সহ-অধিনায়ক এডভোকেট মমিন উল্যা বি.এল.এফ কে সুসংগঠিত করে হানাদার বাহিনীর উপর তীব্র আক্রমণ রচনা করেন। প্রথমাবসহায় সদর পূর্বাঞ্চল, কোম্পানীগঞ্জ ও সোনাগাজী এলাকায় জনাব আবদুর রেজ্জাকের কমান্ডে মোসতফা কামাল, নিজাম উদ্দিন ফারতকসহ বিএলএফ এর একটি দল বেশ কয়েকটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং সফলতা অর্জন করেন। এ সকল যুদ্ধে বিএলএফএর বীর সদস্য ছালেহ আহম্মেদ (যাঁর নামে চৌমুহনী সরকারি কলেজের নামকরণ করা হয়), আবদুর রব, বাবু, মোঃ ফারতক, মোঃ ইসমাইল, আবু নাসেরসহ আরো অনেকে শহীদ হন। এ সময় তৎকালীন ডাকসুর সমাজ সেবা সম্পাদক অহিদুর রহমান অদুদ সুধারাম থানা এবং ওবায়দুল কাদের কোম্পানীগঞ্জ থানা বিএএলএফ এর কমান্ডার নিযুক্ত হন। কবিরহাট, চাপরাশির হাট, বসুরহাট ও তালমোহাম্মদের হাটের যুদ্ধসহ তারা যৌথভাবে সদর, কোম্পানীগঞ্জে বেশ কয়েকটি যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তালমোহাম্মদের হাটের যুদ্ধে সদর বিএলএফ কমান্ডার অহিদুর রহমান অদুদ শহীদ হলে এনাম আহসানকে সদর পূর্ব ও ফজলুল হক বাদলকে সদর পশ্চিম বিএলএফ এর দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

অবশেষে এফএফ ও বিএলএফসহ সম্মিলিত বাহিনীর বীর যোদ্ধাদের চরম আক্রমণে পাক হানাদার ও তাদের দোসর বাহিনীর পরাজয় ও পশ্চাদগমনের মধ্য দিয়ে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ নোয়াখালী পাহানাদার মুক্ত হলে গ্রামগঞ্জ থেকে অজস্র বিজয় মিছিল এসে নোয়াখালী টাউনকে মিছিলে মিছিলে মুখরিত করে তোলে। অবশেষে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭১ আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে রচিত হলো নোয়াখালী মুক্তির অবিস্মরনীয় ইতিহাস।